সত্যং প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ

(শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীর 'অমৃত প্রবাহ' গ্রন্থের অন্তর্গত "শক্তিস্বরূপ" প্রবন্ধের অংশবিশেষ)

ক্ষরাক্ষর, সৃষ্টিপ্রপঞ্চাতীত, কূটস্থ, শুদ্ধচিৎস্বরূপ, অসঙ্গ, উদাসীন, একমেবাদ্বিতীয়ম্, পুরুষোত্তম, কার্য্যকারণাতীত — সুতরাং এই পরিদৃশ্যমান অনুভূয়মান জগতের কারণ কি? ইহা কি স্বয়ম্ভু, অকারণোৎপন্ন, আকস্মিক বা রাসায়নিক বস্তুসংযোগজ? এই প্রশ্ন স্বতঃ চিত্তে উত্থিত হয়। জগন্মধ্যে বাস করিয়া, অবধারিত সত্য পরিমাপে জগৎ-সত্যতা উপলব্ধি করিয়া জগৎকে মিথ্যা, কাল্পনিক বা শূন্য বলা যায় না। এই জগৎ-তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়াই মননশীল ও চিন্তাশীল মনিষীদের জ্ঞান প্রজ্ঞান সংশ্লেষণ বিশ্লেষণ দ্বারা যাবতীয় দর্শন ও বিজ্ঞানতত্ত্ব উৎপন্ন হইয়াছে। বিস্ময় উৎপাদনকারী এই বিশাল জগৎ মানবের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে, তার বুদ্ধির দ্বারে অনিবার্য্য আঘাত হানিয়া জিজ্ঞাসা, অনুসন্ধান ও সমালোচনার সৃষ্টি করিয়াছে; প্রবিহিতমনা মানবকে বিজ্ঞানী ও প্রজ্ঞানী করিয়াছে। জগৎই জগদীশ্বরের জিজ্ঞাসা ও তথ্যানুসন্ধানে প্রেরণা জাগাইয়াছে। সুতরাং জগৎকে অসত্য বলা চলে না। তবে আমরা যে সত্যের মাপকাঠিতে জগৎসত্যতা নিরূপণ করি, তাহার সত্যতা অনুসন্ধেয়। আমরা সাধারণতঃ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগ্রাহ্য বস্তুকেই সত্য বলিয়া অবধারণ করিয়া থাকি, কিম্বা বস্তুর কার্যকারিতা ও প্রয়োজনসিদ্ধির (Pragmatism and Utilitarianism) উপরই সত্যনির্ণয় করিয়া থাকি — কিন্তু ঐ সকল প্রমাণ এবং আধুনিক বিজ্ঞানপ্রমাণ বহির্জগতের সত্যের আবরণ যতই উন্মোচন করিতেছে, ততই পূর্ব্বনির্ণীত সত্যগুলি অসদন্তঃপাতী হইয়া নবীনতর সূক্ষ্মতর এবং দুরবগাহ্য সত্যের সন্ধান ও আভাস দিতেছে; এমন কি, চরমসত্যকে বুদ্ধিগ্রাহ্যম্ অতীন্দ্রীয়ম্ বলিয়াও (Unknown and Unknowable) ঘোষণা করিতে পশ্চাৎপদ হইতেছে না। এক্ষণে ইহাও পরিস্ফুট হয় যে, জগতে কোথাও, কোনোসময়ে বাস্তবসত্যের একাধিক রূপ দেখা দিতে পারে না। কারণ সত্যের সংজ্ঞাই হইল যাহা একরূপ অপরিবর্ত্তিত, নিত্যশাশ্বত, নিরপেক্ষ তত্ত্ব। এই সংজ্ঞা জগতে কোথাও প্রযোজ্য নহে, কারণ জগৎ প্রতিক্ষণেই পরিবর্ত্তনশীল —

"যৎ যৎ রূপেণ নির্ণীতং তদ্রূপং ন ব্যভিচারতি তৎসত্যং।"

যাহা একবার যে-রূপে নির্ণীত হইয়াছে, তাহা যদি কোনোকালেও পরিবর্ত্তিত না হয়, তবেই তাহা সত্য। কিন্তু আমরা এই 'জগত্যাং জগৎ'-এ এরূপ অব্যভিচারী সত্যের কোনোদিনও সন্ধান পাইব না, পাই নাই এবং পাইবার সম্ভাবনাও নাই। কারণ দৃশ্যজগৎ দ্রষ্টাজগৎকে সর্ব্বদাই অতিক্রমণ করিয়া থাকিবে, অথচ দ্রষ্টা ও দৃশ্য উভয়ই জগদন্তঃপাতী। যুষ্মদ্ ও অস্মদ্ লইয়াই পরিদৃশ্যমান ও অনুভূয়মান জগতের ধারণা আমাদের অহরহ হইতেছে — ইহাকেই পরাপ্রকৃতি ও অপরাপ্রকৃতি, ক্ষর ও অক্ষর, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞরূপে ব্যাবৃত ও অব্যাবৃতরূপে, অহং ও ইদংরূপে, জীবপ্রকৃতি ও ভূতপ্রকৃতিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং এই দুইরূপই অবিরত পরিণামী।

"ন ক্ষণমপি অপরিণম্য তিষ্ঠতি"

প্রকৃতির ক্ষোভ হওয়া অবধি একক্ষণও প্রকৃতি অপরিণামিনী না হইয়া থাকিতেই পারেন না এবং যাহা পরিণামী, তাহাই দৃশ্য, তাহাই অসৎ ও উৎপত্তি-বিনাশশীল — ইহাও অবশ্যস্বীকার্য্য।

"যৎ উৎপত্তিমৎ তৎ কার্য্যং তদনিত্যং যথা ঘটঃ" —

ঘট যেমন কোনো এককালে মৃৎ-সম্ভূত হইয়া অবিরত পরিবর্ত্তনশীল হইতে হইতে পরিশেষে এককালে ঘটরূপতা পরিহার করিয়া অন্যরূপ ধারণ করিয়া থাকে — এই পরিদৃশ্যমান বিশাল বিপুল আপাতপ্রতীয়মান স্থির সত্তাবিশিষ্ট জগতও তেমনি অবিরত দেশ, কাল ও বস্তুবিশেষে অন্তঃপাতী হইয়া ভিন্নাকারে পরিণত হইতেছে। সুতরাং ইহাও কার্য্য। এক্ষণে কার্য্যমাত্রই কারণসম্ভূত; ব্যক্ত কার্য্য অব্যক্ত উপাদানে পরিণত হইতেছে। যে মূল উপাদান হইতে প্রতীয়মান জগৎ বাহির হইয়া প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে এবং যে অব্যক্ত উপাদানে লয়প্রাপ্ত হইয়া পুনঃ ব্যক্ততার দিকে প্রধাবিত হইতেছে, তাহাই প্রকৃতি, তাহাই শক্তি। তাহাকেই মায়া, অবিদ্যা, প্রকৃতি, শক্তি, অভাব, যোনি, মহৎব্রহ্ম, দ্বিতীয়া প্রভৃতি নানা আখ্যা দিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

"পরাস্য শক্তি বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ"

ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিদ্বারা সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণাত্মিকা প্রকৃতি বিবিধ আকারে অনাদিকাল হইতেই পরিবর্ত্তনশীল হইয়া আছেন এবং এই পরিণাম, পরিবর্ত্তন ও রূপান্তরগ্রহণ অবিরত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কালবিবর্ত্তনের প্রতিক্ষণেই সংঘটিত হইতেছে। এই কার্য্যভূত জগতের কারণাবস্থাকেই প্রকৃতি বলা হইতেছে। ইহাকেই প্রকৃতি, মায়া ও অণু বলা হইয়া থাকে। ব্রহ্মের ন্যায় এই প্রকৃতিও অনুমানগম্য, দুর্জ্ঞেয় ও অনির্ব্বাচ্য।

"গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথমৃচ্ছতি
যদ্ভদৃষ্টিপথং প্রাপ্তং তং মায়েত্যব সুক্তুকম্
নামরূপাভি বিনির্মুক্তং যশ্চিদ্ সংস্থীয়তে জগৎ
তমাহ প্রকৃতিং কেচিৎ মায়ামণ্যেহপরেত্যনু।"

এই ব্রহ্মশক্তিকে মায়া বলা হয় বিচিত্রসৃষ্টিকর্ত্রী জন্য, প্রকৃতি বলা হয় বিকারসৃষ্টিকর্ত্রী জন্য অবিদ্যা বলা হয় আর জ্ঞানাবরণকর্ত্রী জন্য বলা হয় —

"প্রকৃতি ইতে কথ্যতে বিকারোৎপাদনকারীত্বাৎ,
অবিদ্যা জ্ঞানবিরোধিত্বাৎ মায়া বিচিত্রসৃষ্টিকারিত্বাৎ" —

এই শক্তির দুইটি ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় — আবরণ ও বিক্ষেপ — অর্থাৎ ইহা ব্রহ্মকে আবরণ করিয়া ব্রহ্মে জগতকে বিক্ষিপ্ত করে। •••• এইজন্য ব্রহ্মকেই অভিন্ন নিমিত্তোপাদানকারণ বলা হয়। অন্যমতে প্রকৃতি উপাদান ও ব্রহ্ম নিমিত্তকারণ বলিয়াও পরিগৃহীত হইয়াছেন। এইজন্যই এই প্রকৃতিকে জড় বলা হয়, চৈতন্যের ঈক্ষণব্যতীত বা শক্তিসঞ্চারব্যতীত প্রকৃতি নিষ্প্রভা, নিষ্ক্রিয়া এবং নিষ্কারণা। •••• চৈতন্যের পুরুষার্থসিদ্ধির জন্য প্রকৃতিই শক্তিশস্যভান্ডার। পুরুষ না থাকিলে প্রকৃতি জড়া, নিষ্ক্রিয়া, অচেতন। ••••

প্রকৃতির লয় হইলেও পুরুষ বিদ্যমান থাকেন। পুরুষের অবভাসদ্বারাই প্রকৃতির কারণকার্য্যকারিতা সিদ্ধ হইতে পারে, যেমন নাট্যশালাস্থিত আলো বা তাহার প্রকাশ — নাট্যমালিক মঞ্চস্থ নর্ত্তকী ও দর্শকদের সকলকেই প্রকাশিত করে এবং নাট্যসমাপ্তির পরেও সেই আলো নিজ-স্বরূপে অব্যাহত থাকে, তদ্রূপ। এই শক্তিকেই সর্ব্বদেবগণসমূহমূর্ত্তি বলা হয়। বস্তুতঃ, চৈতন্য উপলক্ষিত দেবতাগণই স্ব স্ব শক্তি ও আয়ুধ প্রদান করিয়া মহিষাসুরবধের জন্য দেবীর রূপায়ণ করিয়াছিলেন। •••• তাই এই মায়াশক্তি দৈবী, এই শক্তি দুরত্যয়া, এই শক্তিই চৈতন্যের সহধর্ম্মিণী এবং চৈতন্যে ওতপ্রোত আছেন বলিয়াই চৈতন্য হইতে অভিন্ন শিবশক্তিমূর্ত্তি, অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তি প্রভৃতি বিবিধ পুরুষশক্তি অভিব্যক্তির ধারণ করিয়া আছেন। চিৎশক্তি অপরিণামিনী। •••• এই চিৎশক্তির পরপারেই দ্রষ্টা বা শুদ্ধাত্মা স্বরূপে বিদ্যমান। এই চিৎশক্তির উপাসনার আশ্রয় বা করুণা ব্যতিরেকে শুদ্ধাত্মাস্বরূপের দর্শন সম্ভবপর নহে। জগতের সর্ব্ববিকার, সর্ব্বদুঃখসঙ্কট, আবিলতা, মলিনতা এই শুদ্ধচৈতন্যের স্রব্যবহিত পরমপ্রেমাস্পদা অভিন্নাত্মস্বরূপিণী জগদম্বা বা মাতৃআশ্রয় না করিলে মায়াকে পরাহত করা সম্ভবপর নহে। এইজন্য স্বয়ং ভগবানের অবতার শ্রীরামচন্দ্রকেও রাবণবধের জন্য এই শক্তির অকালবোধন করিয়া মায়ের প্রসন্নতা অর্জ্জন করিয়া তবে অসুরনিধনে তাঁহার সামর্থ্য লভ্য হইয়াছিল। ••••

যাহা হউক, আমরা রূপ ও গুণজীবি জীব হইয়াই জগতে বাস করিতেছি, তাই আমরা নিরাকারে সাধারণতঃ আকৃষ্ট নহি এবং নিরাকার বস্তু হইতে সাধারণতঃ আমরা কোনো প্রেরণাও পাই না। তাই আমরা সকলেই শক্তির অর্থাৎ মাতৃজগদম্বার ক্রোড়ে লালিতপালিত হইয়া তাঁকেই আমাদের জীবনের সম্পদ-বিপদের একমাত্র আশ্রয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। সেই শক্তিময়ী মায়ের অঞ্চল ধরিয়াই এই গহন সংসারপথে আমরা শ্রেয়ঃপথ, শান্তির পথ ও পরিপূর্ণতার পথ খুঁজিয়া পাই। তাই প্রতিগৃহে মাতৃউপাসনার মাতৃপূজার আহ্বান নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে। জগতের দশদিক ব্যাপিয়া দশমহাবিদ্যারূপিণী মহাশক্তি জড়জগতের মাঝে প্রাণসঞ্চার করিতেছেন। এই মাতৃশক্তির কোলেই আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি, লালিতপালিত হইতেছি এবং এই মাতৃশক্তির সঞ্জীবনশক্তিই আমাদের জীবনের সঙ্গে নিত্য ওতপ্রোত রহিয়াছে।

তাই আমরা সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্বব্যাপ্তা মহাশক্তিকেই আবাহন করিয়া প্রবোধন করিয়া মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোপ্রধান গুণময়ী মাকে কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানসাধনার অবলম্বনীয় মাকে বিগ্রহ কল্পনা করিয়া প্রাণসঞ্চার করিয়া আরাধনা করিয়া আমাদের আমিত্বরূপ মহাসুরকে 'চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্ট্বা' — অন্তরকৃপাময়ী বহিঃ নিষ্ঠুরা মাতৃশক্তির চরণে উৎসর্গ করিয়া থাকি। যতই তাঁহাকে আমরা আমাদের জীবনের মধ্যে বরণ করিয়া লইব, ততই তিনি মহিষাসুর, চণ্ডমুণ্ড ও শুম্ভনিশুম্ভনাশিনী হইয়া আমাদের এই দুরত্যয়া অহমিকাকে নাশ ও সংহার করিয়া তাঁহাতেই আমাদের সকলকে আত্মস্থ করিয়া লইবেন। আমাদের সকল কামনা, সকল ভাবনা, সকল প্রচেষ্টা যেন বিশ্বস্থিতি-সংহার-প্রসবকারিণী মাতৃচরণে চিরোৎসর্গ করিয়া, এই মর্ত্তজীবন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মায়েরই স্বরূপসত্তার পরম দ্যুতিতে আত্মশীল হইয়া থাকিতে পারি — আমাদের এই শক্তিপূজা ও আরাধনা যেন সার্থক হইয়া যায়।